ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ [redacted]পাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—২৭।১২।১৯৪৩

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' পুস্তকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে। এই জীবনী প্রধানতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বলিখিত। ইহাই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাদটীকাগুলি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Abstract of Services....1866 to 1896 [*Prepared on retirement from service*] পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

ইহাঁর পিতার নাম ৺বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। নিবাস ২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রাম।...ইনি ১২৫৪ সালে, ৬ই শ্রাবণ বুধবার জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা খড়দার মুকুটী,—কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। ত্রৈলোক্য বাবু নিজে চারিটি বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহারও নিকট তিনি একটিও পয়সা গ্রহণ করেন নাই...

ত্রৈলোক্য বাবু শিশুকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাহার ভয়ে গ্রামের অনেকে শশব্যস্ত থাকিত।...কিন্তু এত দুষ্টামি করিয়াও ত্রৈলোক্য বাবু ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভাবনীশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই মনগড়া একরূপ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ নূতনতর এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। কাষ্ঠফলকে ও মাটির চাক্‌তিতে সেই বর্ণমালা সংযোজিত করিয়া, বালক ত্রৈলোক্যনাথ আপন মনে নানাবিধ, অস্ফুট গান, হেঁয়ালি, শ্লোক প্রভৃতি রচনা করিয়া, কোন রকমে তাহা ছাপিতে লাগিলেন। ইহাঁর বয়স তখন অনুমান নয় বৎসর। সেই

সব বর্ণমালা,—পিটম্যানের "সংক্ষিপ্ত লেখার" সহিত অনেক মিলিয়া যায়। এই পিটম্যানের সঙ্কেতের সহায়তায় এক মিনিটে এক শত আশীটি কথা লেখা গিয়া থাকে।

গ্রামের স্কুলে ও পাঠশালায় ত্রৈলোক্যনাথের শিক্ষা আরম্ভ। ১৮৫৯ সালে গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া যায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যনাথ হুগলী-চুঁচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন, ৬০ সালে ডবল প্রমোশন পাইয়া ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হন, ৬১ সালে কিছু দিনের জন্য ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া স্কুলে পড়েন। পুনরায় ঐ ডফ সাহেবের স্কুলে আসিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৬২ সালে গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। তাহাতে ইহার পিতামহার পরলোক ঘটে, পরে মাতা এবং তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও খুব জ্বরে আক্রান্ত হন।.. এইখানেই ত্রৈলোক্যনাথের লেখা পড়া শেষ হইল।

ত্রৈলোক্য বাবুর পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এখন ত্রৈলোক্যনাথের একমাত্র অভিভাবক—পিতার জ্যেঠাই এবং মার পিসী। ত্রৈলোক্যনাথের বয়স ঐ সময় চৌদ্দ পনর বৎসর। ত্রৈলোক্য বাবুর জ্যেষ্ঠ, শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, ইনিও সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত।* ত্রৈলোক্য বাবু মধ্যম। তাহার নীচে আর চারিটি ছোট

---

* ২৭ জুন ১৮৪৩ তারিখে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাঁহার লিখিত এই কয়খানি পুস্তকের নাম জানা যায়:—১। শরৎশশী, ২। বিজ্ঞান-দর্শক, ৩। চিত্তচৈতন্যোদয় (কবিতা, ২৮ মাঘ ১২৭৪, পৃ. ৩৬), ৪। বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার (কাব্য, ফাল্গুন ১২৮৫, পৃ ১৩৯), ৫। হরিদাস সাধু। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার উপাখ্যান (১২৯০ সাল, পৃ ৩২), ৬। বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (১২৯৩ সাল, পৃ. ৩-৬৯৬) রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত।

'সোমপ্রকাশ', 'কল্পদ্রুম', 'আর্য্যদর্শন' ও 'জন্মভূমি'তে রঙ্গলালের অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাই। সকলেই এই সময়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত। ইঁহাদের পৈতৃক জমিসমূহ প্রজাবিলি ছিল। বাগান-বাগিচা ও গাছ-পালাও কিছু ছিল, কিন্তু ১৮৬৪ সালের ঝড়ে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। সংসারে বড় কষ্ট। রোগে, দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬৫ সালে জানুয়ারী মাসে বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন। তিনি মানভূম-পুরুলিয়ায়, আত্মীয় শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা করেন। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে গেলেন। তখন পয়সা ফুরাইয়া গেল। রাণীগঞ্জ হইতে মানভূম তিন দিনের পথ। বন, জঙ্গল, পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ত্রৈলোক্যনাথ এত পথ হাঁটিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাণীগঞ্জে ইনি দামোদর নদ যখন পার হন, তখন একটি হিন্দুস্থানী চাপরাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাপরাসীর সহিত আলাপ হইল। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন—'আমার চাপরাসী বলিল, আসামে গেলে তোমার ভাল চাকরি হয়, এবং আমি তোমায় পাঠাইতে পারি।" ত্রৈলোক্যনাথ সম্মত হইলেন।

চাপরাসীর সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে ফিরিয়া আসেন। চাপরাসীর বাটীতে মস্ত একটা ঘরে তাঁহাকে আটক করিল। সেখানে অনেক নীচ জাতীয় স্ত্রীপুরুষ ছিল তাহারা মাদল বাজাইয়া গান করিতেছিল। এক দিন পরে চাপরাসীর রক্ষিতা একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের দয়ায় ত্রৈলোক্য বাবু কুলি-চালান হইতে উদ্ধার পান। সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমাকে যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবে, তুমি বলিও 'আমি যাইব না'।" ৫।৬ দিনের পরে চাপরাসী, কুলিগণ সমভিব্যাহারে ত্রৈলোক্য বাবুকে লইয়া যাইতে চাহে, কিন্তু ত্রৈলোক্য বাবু পথিমধ্যেই পলায়ন করেন। পুনরায় তিনি মানভূমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাস্তায় বন্য কুলের গাছ ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ কুল খাইয়াই দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ইনি মানভূমে পঁহুছিলেন। ইহাঁর আত্মীয় ইহাঁকে স্কুলে দিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগকে ছোটনাগপুরের কমিশনরের আদেশে রাঁচির মেলা দেখিবার জন্য যাত্রা করিতে হইল। রাঁচি মানভূম হইতে পাঁচ দিনের পথ। পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল দিয়া যাইতে হয়। ত্রৈলোক্য বাবুও বালকদের সহিত গেলেন। সকলে গরুর গাড়ীতে গমন করিলেন। মানভূমের ডেপুটী কমিশনর এবং আমলাবর্গ এই সঙ্গে গমন করেন। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন,

"স্কুলের মধ্যে আমলারাই অভিভাবক। ২।৪ দিনের মধ্যে বালকদের আমি কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলাম। সকলকে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, মা'র কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কাঁসাই নদীর মূল নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিলাম। ইহাতে বালকগণের অভিভাবকগণ বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। যথাদিনে রাঁচি পঁহুছিলাম।

"কিন্তু অল্প দিন পরেই রাঁচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ অনুসরণ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দু'জন ঢাকাই মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্যপ্রদেশে তাহারা হাতী ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছু দিন পরে জঙ্গলের মাঝে এক দিন তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল। পুনরায় রাঁচি আসিলাম। রাঁচি হইতে আবার মানভূমে আসিলাম। কিন্তু স্কুল ছাড়িয়া দিলাম, বর্দ্ধমানের নিকট গদা নামক স্থানের রেফাকমুদ্দেন নামক এক জন মৌলবী তখন মানভূমে থাকিতেন। তাঁহার নিকট

পার্সী শিক্ষা করিলাম। অল্প দিনে পন্দনামা, আমদ্‌নামা, গোলেস্তা, বোস্তা শেষ করিলাম।

"বাড়ীর কষ্ট সর্ব্বদাই মনে জাগিত। পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিলাম। অল্প দিনের জন্য ইছাপুর গ্রামে একটিনী করিলাম। চারি মাস পরে সে কাজ গেল। গ্রামের জনৈক আত্মীয় যশোহর জেলায় কন্‌ট্রাক্টরের কাজ করিতেন। যশোহর-কোটচাঁদপুরে যাইতে পারিলে, দু'পয়সা হইতে পারে, তিনি এইরূপ ভরসা দেন। কোটচাঁদপুরে গেলাম। কন্‌ট্রাক্টর আত্মীয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাটী আসিলাম। আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায়—সেই সময়ে বর্দ্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটী-ইনস্পেক্টর অব-স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাষ্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন, সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন, সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন; কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।

"রামপুর হাট হইতে পদব্রজে শিউড়া ফিরিয়া আসিয়া…বর্দ্ধমানের দিকে চলিলাম। ৫।৬ ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। অতিকষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়ীতে কোনরূপ শুভকার্য্য হইয়াছে;—ইহাদের বাড়ীতে খাইতে পাইব। তাহারা

জাতিতে সদ্গোপ। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জ্জীবিত হইল। পুনরায় বর্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।...”

ত্রৈলোক্য বাবু বর্দ্ধমান গিয়া হরকালী বাবুর কাছে শুনিলেন, তাঁহার পিতামহী অত্যন্ত পীড়িতা। ত্রৈলোক্যনাথকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধা কাঁদিতেছেন। তখন ত্রৈলোক্যনাথের হাতে একটিও পয়সা ছিল না। হরকালী বাবুর নিকট চাহিলে যদিও তিনি পথ খরচ দিতেন,—যদিও পূর্ব্বদিন অনাহারে ছিলেন, তথাপি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন,—

“সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি ষ্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধাঘাটে পড়িয়া রহিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, দুদিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, ত কাল প্রাতে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথচলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেতুল গাছ হইতে তেতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময় নগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন,—আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। এক জন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম। দিদিমা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

“কিছু দিন পরে বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুলমাষ্টারি

করিলাম। আত্মীয় হরকালী বাবুর চেষ্টায় এ কাজ হয়। অল্প দিনের মধ্যে রাণীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়ায বদলি হইলাম। এ স্থানেব স্কুলেব দ্বিতীয শিক্ষক হইলাম।* বেতন ১৮৲ টাকা। এই সময ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। রাত্রি দিন লোকেব কাতব-ক্রন্দনে শবীব কণ্টকিত হইতে লাগিল। অস্থি-চর্ম্মসাব, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায নব-নারী—বালক-বালিকাদেব অবস্থা দেখিযা বুক ফাটিযা যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানেই মবিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মড়াব দুর্গন্ধে পথ-চলা ভার হইল। বাড়ীতে শিশু ভাইগণ,—তাহাদেব নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইযা দিন যাপন করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনেব প্রাবল্য—অতিশয ক্ষুধা। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায দাড়াইতে পাবিতাম না। মাথা ঘুরিযা পাড়বা যাইবাব উপক্রম হইত। তখন পেট ভবিযা কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শবীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এইরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নবনারীগণের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবিলাম যে, যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভাবতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পবে, এইরূপ কার্য্যে আমার মনকে আমি নিযোজিত কবিব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইযাছে যে, ভাবতেব লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ অর্দ্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণেব চক্ষু উন্মীলিত কবিতে যত্ন পাইতেছি।

---

* *1866 67* Served as Second master in the Okra and Head-master in Dwarka Government Aided Schools.

কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখ-মোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন, বড়জোর না হয়, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব দুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্য্যে কয় জনের দৃষ্টি আছে?

"ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি পরিচিত হই। উখড়ায় থাকিতে তাঁহার নিকট হইতে সহসা পত্র পাই যে, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর স্থানে তাঁহার জমিদারীতে স্কুলমাষ্টারির পদ খালি আছে,—বেতন ২৫৲ টাকা। আমি সে স্থানে গমন করিলাম। বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়। গ্রামগুলি এক একখানি দ্বীপের ন্যায় দেখিতে হয়। যেদিকে চাহিবে, জল ও নৌকার মাস্তুল। স্থানান্তরে এমন কি অন্য বাড়ীতে যাইতে হইলেও, নৌকা করিয়া যাইতে হয়। এক দিন নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে দেখি, একটি সামান্য মাটির ঢিপি জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায়, ইহার কেবলমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল,—সেই স্থানে তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই,—কিছুই নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না,—কেবল ঘাড় নাড়াইতে থাকে, কোথায় বাড়ী, কে তাহারা, কি করিয়া তাহারা এই মাটির ঢিপিতে আসিল, কে তাহাদিগকে ফেলিয়া গেল,—তাহার কিছুই তাহারা বলিতে পারে না। ভাবে বুঝিলাম, কোন নৃশংস লোকেরা সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাদিগকে আহার দেয় না, কেহ তাহাদিগের খোঁজ খবর লয় না। কয় দিন তাহারা এই ভাবে সেখানে পড়িয়া আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তবে অতিশয় শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। আমার নৌকায় তুলিয়া সাহাজাদপুরে আনিয়া আমি তাহাদিগকে যত্ন করিতে লাগিলাম। ইহাতে নায়েব মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ইহারা ত অল্প দিন পরেই মরিবে, মরিলে ফেলিবে কে? তুমি ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও, তাহারা যেখানে ছিল, সেই খানে রাখিয়া এস।" আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না। কিন্তু এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, সেই বুড়ীরা নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এই বিষয় লইয়া সে স্থানের কোন কোন ক্ষমতাবান্ লোকের সহিত আমার কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল। অল্প দিন পরে পূজার ছুটিতে বাটী আসিলাম। ছুটির পর কুষ্টিয়া হইতে নৌকা করিয়া পদ্মা দিয়া সাহাজাদপুরের দিকে যাইতেছিলাম। প্রথম দিন একটি চড়ার মাঝখানে নৌকা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর আমি রন্ধন করিতেছিলাম, হঠাৎ নিকটে একটি নিশ্বাসের শব্দ হইল। আমি ভয়ে দৌড়িয়া নৌকার উপর উঠিলাম। মাঝিরা বাঁশ লইয়া সেই দিকে গিয়া তাড়া দিল। কি একটা গিয়া জলে পড়িল, এইরূপ শব্দ হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মাঝিরা বলিল, বোধ হয়, জল হইতে কুমীর উঠিয়া আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার নিশ্বাস পড়িল, তাই আমি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাইলাম। পরদিন প্রাতে নৌকা ছাড়িলাম।

"ইতিপূর্ব্বে বাদলা হইয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। পদ্মায় অতিশয় তুফান উঠিয়াছিল। কিছু দূর গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এক স্থানে তিনখানি বড় নৌকা লাগিয়াছিল, আমরা সেইখানে গিয়া নৌকা লাগাইলাম। পদ্মার নিজ ধারেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ, তাহার

পরে গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা বাতাস উত্তর দিক্ হইতে বহিতেছিল। তুফানও অতিশয় বাড়িল। কত রাত্রি হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু ঘোর কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলাম যে, তুমুল ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকের ঝড়ে আমাদের নৌকাকে ক্রমাগত পদ্মার মাঝখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। লগী পুতিয়া, দড়ি বাঁধিয়া আমরা নৌকা রক্ষা করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু লগী উঠিযা যায়, দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। আমাদের নিকট যে কয়খানি নৌকা ছিল, ঝড়ে একে একে তাহাদিগকে দূরে লইয়া ডুবাইয়া দিল। শেষ বড় নৌকাখানি বায়ুবেগে আমাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। দুইখানি নৌকাই একবারে নক্ষত্রবেগে পদ্মার মাঝখানে চলিল। অল্প ক্ষণ পরেই নৌকা দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইযা গেল। আমাদের নৌকাখানি ডুবিযা গেল। কিন্তু চারি দিক্ হইতে মাটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। একবার আমার নিকটেই দশ-বার হাত মাটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন মাটি চাপা পড়িবার ভয় হইল। কষ্টে পাড়ের উপর উঠিলাম। উঠিতেই ঝড়ে আমাকে ঠিক উড়াইয়া না হউক, ঠেলিয়া লইয়া চলিল; আর একবারে পদ্মার ভিতর ফেলিয়া দিল। পুনরায় বাতাসে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমিও বায়ুর সহিত অতিকষ্টে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলাম। সম্মুখে একটি ছোট গাছ দেখিতে পাইলাম। আগ্রহের সহিত গাছটি ধরিলাম। হাতের চারি দিকে কাঁটা ফুটিযা গেল। বুঝিলাম, গাছটি চাঁরা বাবলা গাছ। সে গাছ ছাড়িয়া দিযা পুনরায় চলিলাম। অল্প ক্ষণ পরে একটি ঝোপ পাইলাম। সে স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। তাহার ভিতর শুইয়া পড়িলাম। অতিশয় কম্প উপস্থিত হইল। আর কিছুই জানি না।

"যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে, দিন হইয়াছে। একজনদের বাটীতে পড়িয়া আছি। বাটীর স্ত্রীলোকেরা আমার গায়ে আগুনের সেক দিতেছে। ক্রমে যখন জ্ঞান হইল, তখন শুনিলাম যে, যাহাদের বাটীতে আছি, তাহারা জাতিতে চণ্ডাল। গ্রামের নাম বুলচন্দ্রপুর। পাবনা হইতে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। প্রাতঃকালে বাটীর পুরুষেরা, জলনিমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবার প্রত্যাশায় পদ্মার ধারে গিয়াছিল। ঝড় তখন দক্ষিণ দিক হইতে চলিতেছিল। বায়ুবেগে পদ্মা হইতে জল উঠিয়া, তুমুল বৃষ্টির ন্যায়, উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িতেছিল। যে ঝোপের ভিতর আমি পড়িয়া ছিলাম, আশ্রয়ের নিমিত্ত চণ্ডালেরা সেই স্থানে প্রবেশ করে। মৃত অবস্থায় আমি পড়িয়া রহিয়াছি, দেখিতে পায়। গলায় পৈতা দেখিয়া, ধরাধরি করিয়া, মাঠ পার হইয়া তাহারা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া আইসে। তাহার পর যত্ন করিয়া আমার পুনরায় চৈতন্য উৎপাদন করে। তিন চারি দিন পরে যখন কিঞ্চিৎ সবল হইলাম, তখন পাবনার দিকে যাত্রা করিলাম।

"কাদামাখা সামান্য একখানি ধুতি পরিয়া, এক-ছুট অবস্থায়, আমার একটি আত্মীয় বৈদ্যবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।...তিনি পাবনায় কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে তিনি বহরমপুরে আছেন। ললিতকুড়ি অথবা অন্য কোন বাঁধের তিনি ইনজিনিয়ার। ৪।৫ দিন তাঁহার নিকট রহিলাম। তিনি আমাকে কাপড় চোপড় কিনিয়া দিলেন। পাবনায় নাটককার দীনবন্ধু মিত্র ও ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার সহিত আলাপ হয়। ইঁহারা দুই জনেই আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। রাখালবাবু আমাকে খরচ দিয়া বাটী পাঠান। তখন বাটীতে কেহই ছিলেন না, বীরভূম জেলায় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট

সকলেই ছিলেন। বাটী আসিয়া আমার জর-বিকার হইল, কোনরূপে রক্ষা পাইলাম।

"বর্দ্ধমানের হরকালী বাবু তখন কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাই তাঁহার নিকট যাইবার বাসনায় বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। হাতে যাহা টাকা-কড়ি ছিল, নৌকা-ডুবিতে সে সমুদয় গিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে টাকার নিমিত্ত পত্র লিখিলে, পাছে তিনি একেলা কটকে যাইতে না দেন, সেই ভয়ে তাঁহাকে লিখিলাম না। ধার করিতে মাথা কাটা যায়, সে নিমিত্ত ধারও করিলাম না।

"যৎসামান্য খরচ লইয়া পদব্রজে চলিলাম। পথে চিড়া, নুন আর লঙ্কা খাইয়া দিন যাত্রা করিতে লাগিলাম। শেষ দিন পয়সা ফুরাইয়া গেল। সেদিন খণ্ডিতর নামক স্থান হইতে একবারে ১০ ক্রোশ রাস্তা চলিলাম। মহানদী সাঁতার দিয়া পার হইলাম। হরকালী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইলাম। অল্প আরোগ্য লাভ করিলে তিনি আমাকে পুলিসের সব ইন্‌সপেক্টরী করিয়া দিলেন।* প্রথম আমাকে কাওয়াজ শিখিতে হইয়াছিল। অল্প দিন পরে কেঁউঝরের লড়াই উপস্থিত হইল। আমাকে তথায় যাইতে আদেশ হইল। কিন্তু প্লীহা জর হওয়ায় পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিয়া আসিবার পর, ভুইয়া, জোয়াঙ্গ, কোল, প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা পরাস্ত হইল। বিচারে কাহারও ফাঁসি হইল, কাহারও বা দ্বীপান্তর হইল। আরোগ্য লাভ করার পর আমি থানার দারোগা হইলাম। কখন বা কোর্টে কাজ করিতে লাগিলাম। এই সময় জাজপুর, ওলাবর, কেঁদারাপাড়া

* *1868-70* : Beginning of Pensionable service, 5th May, 1868. Served as Sub-Inspector of Police in the Cuttack District.

প্রভৃতি স্থানে দারগা-গিরি করিয়া ভ্রমণ করিলাম। কার্য্য সম্বন্ধে লেখা পড়া উড়িয়া ভাষায় করিতে হইত ;—১৫ দিনের মধ্যে একরূপ চলন-সই উড়িয়া ভাষা শিখিলাম। ঐ ভাষায় যত ভাল পুস্তক আছে, ক্রমে সব পড়িলাম। তাহার পর কিছু দিন "উৎকল শুভকরী" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিলাম।

"আমাদের যেমন কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, কাশীদাসী মহাভারত আছে, উড়িয়া ভাষায়ও এ শ্রেণীর অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কেবল ভাষায় নহে, উড়িয়াবাসীর প্রতাপও দোর্দ্দণ্ড ছিল। ইহাদের পরাক্রমে কতবার, এক দিকে তৈলঙ্গ, অপর দিকে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজগণকে পরাস্ত হইতে হয়। দুই দিক্ হইতে এরূপ আক্রান্ত হইয়াও উৎকল-বাসীরা সাড়ে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহারা উড়িয়াদিগকে এক্ষণে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কণারক, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরমন্দির, কাঠজুলীর বাঁধ প্রভৃতি ইহাদের কীর্ত্তি আজও দেদীপ্যমান।

"এই সময় আমি উৎকল ভাষা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গলা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করি। কারণ ভারতবর্ষের লোক যত এক হয় ততই ভাল। আমার এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা উঠাইয়া দিয়া, এ প্রদেশে হিন্দী প্রচলন করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে বঙ্গভাষা সম্প্রতি অনেক উন্নতি করিয়াছে, হিন্দী করে নাই। চৈতন্যচরিতামৃত লেখার কালে, ও কাজ অনায়াসে হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, উৎকল ভাষা উঠাইতে কৃতকার্য্য হই নাই; লোকের কেবল বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। কটকে থাকিতে সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাধারণীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা ৺গঙ্গাচরণ সরকারও আমাকে অতিশয় আদর

করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই সকলকে বলিতেন, 'যদ্যপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।'

"এক দিন কটকের কাছারির বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে কাছারির ভিতর লইয়া যাইলেন। সে স্থান হইতে আমরা দুই জনে রোমান কাথলিক গির্জ্জায় একটি বিবাহ দেখিতে যাইলাম। পরস্পরে সদ্ভাব হইল। সাহেব কলিকাতা হইতে কটকে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সার উইলিয়ম হণ্টার। তাঁহার তুল্য দয়াবান্ ভদ্রলোক আমি দেখি নাই। বিলাতে থাকিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত ভারতের দীন দরিদ্রের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে ইংরেজের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তেজস্বী বাক্যে তিনি ইংলণ্ড কম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হণ্টার সাহেব কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। অল্প দিন পরে তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। ১২৫ টাকা বেতনে তিনি একটি চাকরি দিয়া কলিকাতা আসিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। ১৮৭০ সালের মে মাসে হণ্টার সাহেবের আফিসে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।* হণ্টার সাহেব ও তাঁহার মেম আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। আমি ঠিক তাঁহাদের ঘরের লোকের মত ছিলাম। তাঁহারা আমার কত আবদার, কত উপদ্রব যে সহ্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ১৮৭৫ সালে হণ্টার সাহেব

---

* *1870-75* : Served as Second Literary Assistant and Head Clerk in the office of Compiler of Bengal Gazetteers, subsequently Director-General of Statistics to the Government of India.

Assisted in the Statistical Survey of Bengal....Assisted in the compilation of the *Bengal MS. Records*.

বিলাত গেলেন। তিনি আমাকে বিলাত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায় আমি সেবার বিলাত যাইতে পারিলাম না। যদি যাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

"ইংলিশম্যান আফিসে সণ্ডার্স ও বার্কেলে সাহেব আমাকে লইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সদাশয় হণ্টার সাহেবও আমাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় উত্তর-পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য আফিস হইতেছিল। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া দিয়া, এখানে হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করি।* সার এডওয়ার্ড বক্ এই আফিসের কর্ত্তা। পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা সুহৃৎ আমার আর নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমি যে দুই তিন ইংরেজের কাছে কাজ করিয়াছি, তাহারা সকলেই উদারচরিত্র। বক্ সাহেবের আফিসে থাকিতে আমি দেশের উপকারের নিমিত্ত নানারূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিই,—

"উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকার্য্য গঠিত হইত। যথা—কাশীর রেশমের কাপড়, গোটা, পিত্তলের কাজ ইত্যাদি; লক্ষ্নৌয়ের—গোটা, চিকণ, সূচের কর্ম্ম, সোনারূপার কাজ, বিদরীর কাজ, মুরদাবাদের—পিত্তলের উপর মিয়া কলম, নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু-রাজাদের সময়ে এবং মুসলমানদের আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাও এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন।

* *1875-81* Served as Head Clerk, Department of Agriculture and Commerce, N.-W. Provinces and Oudh; subsequently, promoted to Head Superintendentship, finally made Personal Assistant to the Director.

Assisted in the compilation of the N.-W. Provinces Gazetteer.

ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকায্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন; কিন্তু কোথায় পাওয়া যায, ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। এদিকে খরিদদার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্ন-কষ্ট পাইতেছিল। শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষিকায্যে অগ্রসর হইতেছিল। এই কারিকরদিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলাম। বক্ সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ক্রয করিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকট একটি বড় হোটেলে রাখিযা দিলাম। আমি নিজে হোটেল-স্বামী সাহেবের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহাকে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এই হোটেলে বিলাত-যাত্রী সাহেব-মেমগণ দুই এক দিন অবস্থিতি করিতেন। দেশে বন্ধু-বান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত্ত সাহেব-বিবিরা এই সকল দ্রব্য অতি আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেল-স্বামী এক জন ধনবান লোক। তাহার চক্ষু ফুটিল, গবর্ণমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে লাগিলেন।”

১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়।...এই সময়ে [১৮৭৮] ত্রৈলোক্য বাবু জানিতে পারিলেন, গাজোরের চাষ করিয়া ও গাজোর খাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীগণ প্রাণে বাঁচিতে পারে। প্রতি বিঘায় কত গাজোর হয়, চাষাদের ক্ষেত খুঁজিয়া তাহা স্থির করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্বদিন কে কি খাইয়া দিনপাত করিয়াছিল, ত্রৈলোক্য বাবু তাহার তত্ত্ব লইলেন, দুর্ভিক্ষ-সময়ে গাজোর যে অতি উপকারী সামগ্রী, তাহা স্থির করিযা ত্রৈলোক্য বাবু গবর্ণমেণ্টকে

এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা গেজেটে ছাপাইলেন। দুর্ভিক্ষ-সময়ে, যাহাতে তাড়াতাড়ি গাজোরের চাষ করিয়া লোকে প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট জেলায় জেলায় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। দুই বৎসরের পরে রায়বেরেলী, সুলতানপুর প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল। সেই সময় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া যাইত, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে, এই গাজোরের জন্য সে-বার জনপ্রাণী মরে নাই।

১৮৮১ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগে ত্রৈলোক্য বাবুর চাকরি হয়। উত্তর-পশ্চিমের শিল্পের উন্নতির জন্য পূর্ব্বে ইনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমুদয় ভারতের শিল্পকার্য্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম, ভারতে কি কি দ্রব্য হয়? দ্বিতীয়—এই সব দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়? তৃতীয়, কি মূল্যে পাওয়া যায়?—এই সকল কথা লিখিয়া তিনি সামান্য একখানি পুস্তক ছাপাইলেন। এই সামান্য পুস্তকের তালিকার গুণে ইউরোপীয়গণের চক্ষু ফুটিল। ইহার প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের লোক লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল। সাহেবেরা আপনাদের কারুকার্য্য বিক্রয় করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে টাকা লন, কিন্তু আমাদের কারুকার্য্য বেচিয়া সাহেবদের নিকট হইতে কিরূপে টাকা লইব, সে বিষয়ে ত্রৈলোক্য বাবুর বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তিনি এ পর্য্যন্ত অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৮২ সালে হলাণ্ডদেশে আমষ্টার্ডাম্ নগরে এক মহামেলা হয়। গবর্ণমেণ্ট ত্রৈলোক্য বাবুকে ঐ মহামেলায় যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায়, তিনি যাইতে পারিলেন না। এই সময়ে অকারাদি বর্ণানুক্রমে ত্রৈলোক্য বাবু ভারতে কি

কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার একখানি ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন।*

১৮৮৩ সালের কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কোন কোন বিষয়ের অধ্যক্ষভার ত্রৈলোক্য বাবুর প্রতি অর্পিত হয়। নানা দ্রব্যাদি বিচার করিয়া মেডেল দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক জন বিচারকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ সালে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। এইবার ত্রৈলোক্য বাবুকে বাধ্য হইয়া বিলাত যাইতে হইল। দেশের বহু উপকারের সম্ভাবনায় তিনি গেলেন। বিলাতে সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিল। মহারাণী ও রাজপুত্রগণ এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে অনেক আদর করিয়াছিলেন। বিলাত গমনকালে কয়েক জন উদারহৃদয় সন্ন্যাসী সাধুর নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বিলাত গিয়া নিজের স্বার্থের দিকে তিনি একবারে দৃষ্টি রাখিবেন না। বিলাতের কোন কোন বড়লোক তাঁহাকে উচ্চ পদ পাইবার নিমিত্ত ভারতের গবর্ণর-জেনারলের নিকট চিঠি দিবার জন্য

---

* *1881-87* Transferred to the Revenue and Agricultural Department of the Government of India in September, 1881. Served as 2nd Grade Assistant; officiated as 1st Grade Assistant; gazetted as "Officer in charge of the Indian Exhibits for the Amsterdam International Exhibition" (24 Aug. 1882), and again subsequently gazetted as "Officer in charge of the Exhibition Branch of the Government of India" (16 March 1883.)

1881-82. At the request of the Honourable Member (Sir Rivers Thomson?) then in charge of the Department, published for Government a work entitled "A Rough List of Indian Art-manufactures."

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহা লইলেন না। এবার বিলাতে তিনি দশ মাস কাল অবস্থিতি করেন।

ইংলণ্ড হইতে ত্রৈলোক্য বাবু স্কটলণ্ডে গমন করেন। স্কটলণ্ড হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, পরে ফ্রান্স, জার্ম্মণী,—তথা হইতে অষ্ট্রিয়া, পরে ইটালী গিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। অল্প দিন পরেই কর্ম্মোপলক্ষে পুনরায় তাঁহাকে তিন সপ্তাহের জন্য বিলাতে যাইতে হয়। ত্রৈলোক্য বাবুর "Visit to Europe" গ্রন্থে সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

বিলাত হইতে আসিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে জয়পুর আসেন। তথায় তিনি তাঁহার আত্মীয় জয়পুরের দেওয়ান পরলোকগত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

ত্রৈলোক্য বাবু ১৮৮৬ সালে রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে চাকরি গ্রহণ করেন।* এই চাকরি করিতে করিতে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে "Art Manufactures of India" নামক একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে দেশের অনেক শিল্পীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থ হওয়ায়, ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে তিনি পেন্সন লন।

* *1887 96* Service in the Indian Museum Assistant Curator in charge of the Bengal Economic and Art Museum collections (1 April 1887).

During the last two years, under the special order of the Government of Bengal, I prepared two Monographs, viz., one on the "Brass and Copper manufactures' and the other on the "Pottery and Glassware" of Bengal

মৃত্যু

ভগ্নস্বাস্থ্য ত্রৈলোক্যনাথ শেষ জীবনে পুরীর সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিলেন। তথায় ৩ নবেম্বর ১৯১৯ তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ বাংলা রচনা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ও বঙ্গবাসী-কর্ত্তৃপক্ষ-পরিচালিত 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পাদি ছাড়া ভারতে সুবর্ণ, লৌহ, পাথুরে কয়লা, ইস্পাত, এড়ী রেশম, গজ-দন্ত প্রভৃতি তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ তিনি 'জন্মভূমি'তে প্রকাশ করিয়া পাঠক-সমাজকে উপকৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দিলাম :—

বাংলা

১। **কঙ্কাবতী।** (উপকথার উপন্যাস) ১২৯৯ সাল। পৃ. ৩০১।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রাহার গ্রন্থ-সংগ্রহে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে।

২। **ভূত ও মানুষ।** (গল্প) ইং ১৮৯৭।

স্ূচী ঃ—বাঙ্গাল নিধিরাম, বীরবালা, লুল্লু, নয়নচাঁদের ব্যবসা।

৩। **ফোকলা দিগম্বর।** (সামাজিক উপন্যাস) ১৩০৭ সাল (৪ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ১৯৫।

৪। **মুক্তা-মালা।** (উপন্যাস) ইং ১৯০১। পৃ. ৩২০।

৫। **ময়না কোথায়!** (উপন্যাস) আশ্বিন ১৩১১। পৃ. ১৫৪।

৬। **মজার গল্প।** ১৩১২ সাল। পৃ. ১৭২।

স্চী ঃ—সোনা-করা জাতুগরেব গল্প, ভানুমতী ও কস্তম, জাপানের উপকথা, পূজার ভূত, পিঠে-পার্ব্বণে চীনে ভূত, বিদ্যাধরীর অরুচি, মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি, একঠেঙো ছকু।

৭। **পাপের পরিণাম।** (উপন্যাস) ১৩১৫ সাল। পৃ. ২৯৯।

৮। **ডমরু-চরিত।** (গল্প) ইং ১৯২৩। পৃ. ১৯৭।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী। ১ম ও ২য় খণ্ড। পৃ. ২৬৮ ও ৩৮৩।

ইহা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈলোক্যনাথ অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে এই কয়খানির নাম জানা গিয়াছে ঃ—

(ক) **বিজ্ঞানবোধ।** রায় বাহাদুর কানাইলাল দে ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইং ১৮৯৬। পৃ. ১০৯।

(খ) **নীতিশিক্ষা**, ১ম-২য় খণ্ড। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়লাল দে। ১ জানুয়ারি ১৯০২। পৃ. ৭৪।

(গ) **বিজ্ঞান শিক্ষা**, ১ম-২য় খণ্ড। ২১ জানুয়ারি ১৯০২। পৃ. ৬৬।

(ঘ) **প্রথম শিক্ষা**। ২৪ মার্চ ১৯০২। পৃ. ৩২।

(ঙ) **বিজ্ঞান-প্রবেশ**। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় কর্নেল কে পি গুপ্ত-প্রণীত। ১৩১১।

(চ) **সরল শিক্ষা**। পৃ. ৩৬।

(ছ) **বিজ্ঞান শিক্ষা**। নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইং ১৯০৫। পৃ. ১৩৮।

(জ) **চতুর্থ পাঠ্য পুস্তক**। মৌলবী সিরাজ-উল-ইসলাম ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইং ১৯০৯। পৃ. ৬৭।

ইংরেজী

ত্রৈলোক্যনাথ যে-সকল ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

1. *A Descriptive Catalogue of Indian Products* contributed to the Amsterdam Exhibition 1883. Cal. 1883, pp. 190.

2. *A Hand-Book of Indian Products* (Art Manufactures and Raw Materials). Cal. 1883, pp. 175.

3. *A List of Indian Economic Products* compiled from the Catalogue of Economic Products of India, exhibited in the Economic Court, Calcutta International Exhibition, 1883-84. Cal. 1884, pp. 93.

4. *Art-Manufactures of India* (specially compiled from the Glasgow International Exhibition 1888). Cal. 1888, pp. 451.

5. *A Visit to Europe* (with a Preface by N. N. Ghose, Bar-at-law). Cal. 1889, pp. 404.

ত্রৈলোক্যনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

ত্রৈলোক্যনাথকে আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশে ব্যঙ্গ ও আজগুবি রসের ক্ষেত্রে কয়েক জন সাহিত্যিক খ্যাতনামা হইয়াছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ত্রৈলোক্যনাথ স্বয়ং তাঁহার যথাযোগ্য আসন পান নাই। এইরূপ হইবার কারণ সাহিত্যিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয়। বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে এক জন প্রবীণ কৃত্যবিদ্য অধ্যাপক কিছু কাল পূর্ব্বে যে সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁহারও পাকা দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা, আধুনিক বিচারকদের দরবারে পুনর্বিচারের জন্য ত্রৈলোক্যনাথ যথেষ্ট নথিপত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাই অংশতঃ শুধু নমুনা-হিসাবে আমরা এখানে দাখিল করিলাম। আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ বাঙালী পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবার মত সাহিত্যরস এই খণ্ড-উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই আছে। এগুলি পড়িয়া যদি কেহ ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ডমরু-চরিত' প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বাংলা-সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন রসের সন্ধান পাইবেন। বাংলা ভাষায় এমন আজগুবি ও ভূতুড়ে গল্প আর কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। ত্রৈলোক্যনাথের ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত এমন এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি যে

কেমন করিয়া এমন সহজ সরল সরস বাংলা গল্প লিখিতে পারিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহার কর্ম্মোদ্যম ও পাণ্ডিত্য এক দিন 'বিশ্বকোষ' রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনিই বাংলা দেশের বালক-বালিকা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসর-বিনোদনের জন্য এমন বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহার জুড়ি আজ পর্য্যন্ত মিলিল না। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সরস হইয়াও নির্দ্দোষ। ত্রৈলোক্যনাথের পূর্ব্বে এরূপ নির্দ্দোষ রসিকতা আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম না। আমাদের বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথের রচনা পুনর্ব্বার প্রচলিত হইলে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি বাংলা-সাহিত্যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

'কঙ্কাবতী' ঃ—

নৌকা।

বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন ;—"যাই, নদীর ঘাটে যাই, সেইখানে বসিয়া এক পেট জল খাই, আর গায়ে জল মাখি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।"

নদীর ঘাটে বসিয়া কঙ্কাবতী জল মাখিতেছেন, এমন সময়ে কে বলিল,—"কেও, কঙ্কাবতী ?"

কঙ্কাবতী চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা

স্থির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দূরে কেবল একটি কাতলামাছ ভাসিতেছে, আর ডুবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও কঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী এইবার উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো আমি কঙ্কাবতী।"

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি বড় গায়ের জ্বালা, তোমার কি বড় পিপাসা?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো আমার বড় গায়ের জ্বালা, আমার বড় পিপাসা!"

কে আবার বলিল,—"তবে তুমি এক কাজ কর না কেন? নদীর মাঝখানে চল না কেন? নদীর ভিতর অতি সুশীতল ঘর আছে, সেখানে যাইলে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে, তোমার শরীর জুড়াইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"নদীর মাঝখান যে অনেক দূর! সেখানে আমি কি করিয়া যাইব?"

সে বলিল,—"কেন? ঐ যে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে? ঐ নৌকার উপর বসিয়া কেন এস না?"

জেলেদের একখানি নৌকার উপর গিয়া কঙ্কাবতী বসিলেন। এমন সময় বাটীতে কঙ্কাবতীর অনুসন্ধান হইল। "কঙ্কাবতী কোথায় গেল? কঙ্কাবতী কোথায় গেল?"—এই বলিয়া একটা গোল পড়িল। কে বলিল,—"ও গো! তোমাদের কঙ্কাবতী ঐ ঘাটের দিকে গিয়াছে।"

কঙ্কাবতীর বাড়ীর সকলে মনে করিলেন যে, জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কঙ্কাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছেন।

কঙ্কাবতীর ভগিনী বলিলেন,—

“কঙ্কাবতী বোন্ আমার ঘরে ফিরে এস না ?
বড় দিদি হই আমি ভাল কি আর বাস না ?
তিন ভগ্নী আছি দিদি, দুইটি বিধবা তার।
কঙ্কাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র।”

নৌকায় বসিযা বসিয়া কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

“শুনিযাছি আছে না-কি জলের ভিতর।
শান্তিময সুখময় সুশীতল ঘর।
সেই খানে যাই দিদি পজি তোমার পা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকা খানি হুথ্ যা।”

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন, ভাই আসিয়া কঙ্কাবতাকে বলিলেন,—

“কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি।
রেগেছেন বাবা বড, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার-কথা ?
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।”

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

“কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি।
জ্বলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি।
যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।”

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন কঙ্কাবতীর মা আসিয়া বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার, ঘরে ফিরে এস না ?
কাঁদিতেছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর ক'রো না।
ভাত হল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাত দিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে
তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে।
এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।
কঙ্কাবতীর নৌকাখানি এই ডুবু যা।"

এই বলিতে কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূরে জলে ভাসিয়া গেল।

তখন বাপ আসিয়া বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
কত যে হতেছে ঘটা দেখ তুমি ঘরে গিয়া।
গহনা পরিবে কত আর সাটিনের জামা।
কত যে পাইবে টাকা নাহিক তার সীমা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
দারুণ যাতনা পিতা আর সহে না।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা।"

এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি নদীর জলে টুপ করিয়া ডুবিয়া গেল।

* * *

মেঘের ডালে খোক্কোশ বাঁধিয়া আকাশের মাঠ দিয়া কঙ্কাবতী অতি দ্রুতবেগে চাঁদের দিকে ধাবমান হইলেন।

চারি দিকে জনরব উঠিল যে, আকাশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলের মূল শিকড় কাটিতে, পৃথিবী হইতে মনুষ্য আসিযাছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন উপবনে, ক্ষেত্র উদ্যানে,' যে যেখানে ফুটিয়াছিল, সে সেইখানে বসিয়া মিট্ মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চাঁদের পলাইবার যো নাই, কারণ জগতে আলো না দিয়া পলাইলে জরিমানা হইবে, চাঁদ তাই বিরস মনে মানবদনে ধীরে ধীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাঁদ ভাবিলেন,—"এইবার তো দেখিতেছি, আমার মূল শিকড়টি কাটা যায়। এখন আমি-শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা। এরে বিশ্বাস কি? যদি বলিয়া বসে যে,—'বাঃ। দিব্য চাঁদটি, কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাই।' তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কাজ নাই বাপু। আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশ্বাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাঠ হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে যে, 'এ মরা চাঁদ। মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব? আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।"

বুদ্ধিমন্ত চাঁদ, এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাদকে বিবর্ণ, বিষণ্ণ, মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"বাঃ। চাঁদটি বা মরিয়া গেল? মূল শিকড়টি কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল? আহা কেমন সুন্দর চাঁদটি ছিল। কেমন

চমৎকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত! সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্যার রাত্রি থাকিবে। লোকে আমায় কত গালি দিবে।"

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় মনে মনে বলিলেন, "না, চাঁদটি মরে নাই। বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে। তা ভালই হইয়াছে। কাটিতে কুটিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তার পর করাত দিয়া হাত পা কাটেন। ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আপনি অজ্ঞান হইয়াছে। মূল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টি একেবারে দুই খণ্ড করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালের প্রয়োজন, ততটুকু আমি কাটিয়া লই।"

এইরূপ ভাবিয়া চারি দিক্ ঘুরিয়া, কঙ্কাবতী অবশেষে চাঁদের মূল শিকড়টি দেখিতে পাইলেন। ছুরি দিয়া উপর উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত, চাঁদ অতি কষ্টে যাতনা সহ্য করিলেন, তার পর আব সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উঃ! লাগে যে!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভয় নাই! এই হইয়া গেল।"

তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী চাঁদের মূল শিকড় হইতে এক তোলা পরিমাণ ছাল তুলিয়া লইলেন।

তখন চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার শিকড় পুনরায় গজাইবে তো?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"গজাইবে বৈ কি! চিরকাল কি আর এমন থাকিবে! ইহার উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়িয়া বিষিয়ে উঠবে না।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি ঘা হয় ?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"যদি ঘা হয়, তাহা হইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভাজা ঘি দিও।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বুঝি মেয়ে-ডাক্তার ? দাঁতের গোড়ার ঔষধ জান ? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ কন্ করে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মেয়ে-ডাক্তার নই। তবে, এই বয়সে আমি অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, তাই দুটা একটা ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। তোমার দাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের দাঁত কি চিরকাল সমান থাকে ? তুমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি ? কবে সেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ ! এখন আর ছেলে-চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন ?"

চাঁদ বলিলেন,—"ছেলে-চাঁদ হইতে চাই না ! ঘরে আমার অনেকগুলি ছেলে-চাঁদ আছে। আশীর্ব্বাদ কর, তাহারা বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে আকাশে কত চাঁদ হয় ! আকাশের চারি দিকে তখন চাঁদ উঠিবে ! এখনি আমার ছেলে মেয়েগুলি বলে,—"বাবা ! অমাবস্যার রাত্রিতে তুমি শ্রান্ত হইয়া পড়, সন্ধ্যাবেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা যাই না ? আমরা গিয়া আকাশেতে উঠি না ? আমি তাদের মানা করি ! আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্য্যন্ত, পথটুকু তো আর কম নয় ? তারা ছেলে মানুষ, অত পথ গড়াইতে পারিবে কেন ?"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ছেলে মেয়েগুলি কত বড় হইয়াছে ?"

চাঁদ উত্তর করিলেন,—"বড় মেয়েটি একখানি কাঁশির মত হইয়াছে।

কেমন চক্‌-চকে কাঁশি! তেঁতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁশির সেরূপ রং হয় না! মেজ ছেলেটি একখানি থস্তালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে। কোলের মেয়েটি একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাথুরে পোকার টিপ পরিতে, সেই তত বড় হইয়াছে। কিন্তু কালো হউক মেয়েটির শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর যখন আকাশে কাল-চাঁদ উঠবে, তখন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক সুন্দরী বটে! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্‌-চকে অন্ধকার হইবে, সমুদয় জগৎ যেন বারনিশ চামড়ায় মুড়িয়া যাইবে! তা, যাই হউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে! কিছু যে খাইতে পারি না! ডাঁটা চিবাইতে যে বড় লাগে। ভাল যদি কোনও ঔষধ থাকে, তো আমাকে দিয়া যাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"চাঁদ! তুমি এক কাজ কর! আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতায় থাকেন! কলিকাতায় দন্তকারেরা আছে। তোমার পোকা-ধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নূতন কৃত্রিম দন্ত পরাইয়া দিবে!"

এই কথা শুনিয়া চাঁদের ভয় হইল; চাঁদ বলিলেন,—"আমার মূল শিকড়ে ব্যথা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, তত দূর আমি যাইতে পারিব না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি তোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

চাঁদের প্রাণ উড়িয়া গেল! চাঁদ ভাবিলেন,—"যা ভয় করিয়াছিলাম তাই! কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম! চক্ষু বুজিয়া, চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।"

চাঁদ বলিলেন,—"আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইয়া গিয়াছে, আর ব্যথা নাই। সে জন্য তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আমি বড় ভারি, আমাকে তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না। এখন যাও, বাড়ী যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোক ভাবিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"কি বলিলে? তুমি ভারি। বাপের বাড়ী থাকিতে, তোমার চেয়ে বড় বড় বগী-থাল আমি ঘাটে লইয়া মাজিতাম। এই দেখ, তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কি না।"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর আঁচলটি পাতিলেন। চাঁদটিকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি। এমন সময় চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে খাইতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদনীর কান্নায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের ছানা-পোনার কান্নায় কঙ্কাবতীর কাণে তালা লাগিল।

ভূত ও মানুষ ঃ—

চুরি

"লে লুল্লু," আমীর সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কি বিপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটি আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাত রূপে পতিত হইল। আমীরের বাটী দিল্লী সহরে, আমীর জাতিতে মুসলমান। এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমীর ভিতর হইতে বলিলেন,—"লে লুল্লু" অর্থাৎ কি না, "লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে লইয়া যা।" লুল্লু, কোনও

দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কান্‌কাটারও নাম নয়। "লুল্লু" একটি বাজে কথা, ইহার কোন মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটি ষোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্য্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে, আমীরের বাটীর ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল, শুনিল,—কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন্। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিক নাই।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া শব্দ কিছুই পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে ওখানে চারি দিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন। কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় প্রদীপ হাতে করিয়া আতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীর নামগন্ধও নাই। আবার, আশ্চর্য্যের কথা এই যে বাড়ীর দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি

যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতী-সাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ীর বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার এরূপ কুমতি হয়, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া ত যাইতে হইবে! দ্বার ত আর ফুঁড়িয়া যাইতে পারেন না! দারুণ কাতর হইয়া আমীর এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য, জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য,—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপতাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। "আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম, আমার কথা মত তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কি হইল!" এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের বাটী অন্বেষণ করিল। আমীরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ-ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকী রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয় আমীরের বিবি কোন পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে? এরূপ সুন্দরী নব-যৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কতদিন থাকিতে পারে? আমীর একটু একটু পাকা-আফিম খাইতেন, তাঁহার এই দোষ। এক ত স্ত্রী গেল, তার পর যখন এই কলঙ্কের কথা আমীরের কাণে

উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—"দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মত এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জ্জন দিব।"

ফোক্‌লা দিগম্বর ঃ—

বর্ষা কাল। দুর্জ্জয় বাদল। টিপ টিপ করিয়া সর্ব্বদাই জল পড়িতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার ঘোর করিয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। হু হু করিয়া শীতল পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য! এই দুর্য্যোগে নারিকেল-পত্র দ্বারা আবৃত সেই চালার ভিতর এক ভদ্রমহিলা শয়ন করিয়া আছে। একখানি গলিত, নানা স্থানে ছিন্ন, পুরাতন ময়লা বস্ত্র স্ত্রীলোকটি পরিধান করিয়াছিলেন। সেইরূপ একখানি ছিন্ন, পুরাতন মাদুর ও ছোট একটি ময়লা বালিশ ভিন্ন আর কিছু বিছানা ছিল না। যে মাদুরটির উপর এই মাদুরটি বিস্তৃত ছিল, তাহা নিতান্ত আর্দ্র ছিল। তাহা ব্যতীত নারিকেল পাতার ফাঁক দিয়া, মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা আসিতেছিল; তাহাতে বিছানা, স্ত্রীলোকটির পরিধেয় কাপড় ও সর্ব্ব-শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল। সেই পাতার ফাঁক দিয়া সর্ব্বদাই বাতাস আসিতেছিল! সেই জলে, সেই বাতাসে, সেই ভিজা মেজেতে, সেই ভিজা মাদুরে, সেই ভিজা কাপড়ে স্ত্রীলোকটি পড়িয়া ছিল। এরূপ অবস্থায় সহজ মানুষের কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটির অবস্থা সহজ ছিল না। বিছানার নিকট কিঞ্চিৎ দূরে

কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল। আগুন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে চালার ভিতর বিন্দুমাত্র উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই। স্ত্রীলোক এবং আগুন এই দুইয়ের মধ্যস্থলে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আবৃত একটি নবপ্রসূত শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। আজ চারি দিন এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাই সূতিকাগার।

* * *

গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী

বাস্তবিক এই সময় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ভিড় ঠেলিয়া এক জন মানুষ বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার লম্বা-চওড়া চেহারা দেখিয়া, প্রথম তাহাকে পুরুষ-মানুষ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া সে ভ্রম আমার দূর হইল। চওড়া কল্কাপেড়ে শাড়ী তিনি পরিয়াছিলেন, মুখখানি তাহার বড় একটি হাঁড়ীর মত ছিল। সেই হাঁড়ীর মধ্যস্থল উচ্চ নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই চলের অস্থি দ্বারা, নিম্নদেশ মুখ-গহ্বর দ্বারা, আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। যদি কোন মানুষের ঠিক বাঁশীর মত নাক থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ছিল। মাথার চুলগুলি অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছিল, তবে পাকার ভিতর কাঁচা চুলও অনেক ছিল। মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছিল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা-পাকা চুলের ভিতর হইতে সিন্দুরের ছটা বাহির হইতেছিল। শীতলাদেবী কি সুভদ্রা ঠাকুরাণীও ললাটদেশের এতখানি অংশ সিন্দূরে রঞ্জিত করেন কি না, তা সন্দেহ। সেই সিন্দুরের ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি পতিভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীরে পতিভক্তি আর

ধরে না, তাই তাহার কতকটা এখন মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, তাঁহার দেহটি যেমনি দীর্ঘ, তেমনি প্রস্থে; পাঠানদিগের দেশেও তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়! তাঁহার নাকে নথ ও হাতে শাঁখা ছিল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার দেহে যে অপরিমিত বল ছিল, তাহা তাঁহার আকৃতি ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি যে আমাদের দেশের লোক, বাঙ্গালী, পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া প্রথমেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরও ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ভদ্রকন্যা ও ভদ্ররমণী, আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন। সিন্দুর-প্রসঙ্গে আমি তাঁহার পতিভক্তির উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে তাহার দম্ভপূর্ণ মুখখানি আরও পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীকুলকে বলিতেছিল,—"ওরে অভাগীরা! পতিপরায়ণা সতী কাহারে বলে, যদি তোদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়! এই আমাকে দেখিয়া যা; আমি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ পতিভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমি এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি।"

জনতা ঠেলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, অর্দ্ধভগ্ন গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—"কৈ! কোথায় সে ফোক্‌লা কোথায়! সে মুখ-পোড়া নচ্ছার কোথায়?"

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া, সকলে অবাক হইয়াছিল; এখন তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে আরও অবাক্ হইল। অর্দ্ধ-ভগ্ন গুরুগম্ভীর স্বর! কিসের সহিত সে স্বরের তুলনা করিব? ছেড়া জয়ঢাকের শব্দের সহিত? এতক্ষণ ঘরের ভিতর কত গোলমাল হইতেছিল; কুসুমের চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত কত লোক কত ঔষধের কথা বলিতেছিল,

তাহার পর বিবাহের কথা, সন্ন্যাসী মহান্তের কথা ;—সকলেই একসঙ্গে নানারূপ কথোপকথন করিতেছিল। কিন্তু এখন তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। পিপীলিকার পদশব্দটি পর্য্যন্ত ঘরে আর রহিল না।

গলাভাঙ্গা স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলিলেন,—"কৈ! সে ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়?"

আমার নিকটে বসিয়া, ফোক্‌লা মহাশয় একদৃষ্টে কুসী ও সন্ন্যাসীর মুখ পানে চাহিয়া পাখা নাড়িতেছিলেন। "ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়?" এই গম্ভীর শব্দ শুনিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। আমার পশ্চাৎ দিকে তিনি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীলোকটি কে, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ফোক্‌লাকে আমি লুকাইতে দিলাম না ; আমার পশ্চাৎ দিকে তিনিও যত সরিয়া আসেন, আমিও তত সরিয়া যাই।

ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন,—"এই যে পোড়ার মুখ লুকাইতেছেন! হ্যাঁ রে! ড্যাক্‌রা এ সব তোর কি কারখানা বল্ দেখি?"

দিগম্বর বাবু বলিলেন,—"কেও! মনুর মা! তুমি কোথা হইতে?"

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"আমি কোথা হইতে! আমি যমের বাড়ী হইতে। তোর নড়া ধরিয়া সেইখানে লইয়া যাইব ; সেই জন্যে আমি আসিয়াছি।"

দিগম্বর বাবু বলিলেন,—"এত রাগ কেন? হইয়াছে কি?"

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"কি হইয়াছে? তোমার মাথা হইয়াছে। তোমার মুণ্ড হইয়াছে। এবার বদলি হইবার সময়, এই জন্য বুঝি আমাকে দেশে পাঠানো হইল। আমি যেন আর কোন খবর

পাইব না। আমার যেন আর কেউ নাই। তাই সেদিন খবর পাইয়াই আমি বলিলাম,—"বিন্দি! চল! ফোক্‌লা মুখপোড়া আবার মরিতেছে—"

ডমরু-চরিত ঃ—

ছাল-ছাড়ান বাঘ

এইরূপে চারিদিকে আমি দেখিয়া বেড়াইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সূক্ষ্ম শরীর অতি ক্ষুদ্র, হাওয়া দিয়া গঠিত, সূক্ষ্ম শরীর কেহ দেখিতে পায় না। একে যমদূতের ভয়, তাহার উপর আবার এই সমুদয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! সে স্থানে আমি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম,—"দূর কর! বনে গিয়া বসিয়া থাকি। সুন্দরবনে মনুষ্যের অধিক বাস নাই, যমদূতদিগের সে দিকে বড় যাতায়াত নাই, সেই সুন্দরবনে গিয়া বসিয়া থাকি।"

বায়ুবেগে সুন্দরবনের দিকে চলিলাম। প্রথম আমি আমার আবাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমার কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলাম না। কেহ মাছ, কেহ ঘৃত, কেহ মধু, কেহ পাঁঠা লইয়া তাহারা "আমার" বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সে স্থান হইতে আমি গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, এক গাঙের ধারে একখানি নৌকা লাগিয়া আছে, উপরে পাঁচ ছয় জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। তাহাদের সঙ্গে মুগুর হাতে একজন ফকীর আছে। মন্ত্র পড়িয়া ফকীর বাঘদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নির্ভয়ে কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিতেছে। সেই স্থানে গিয়া আমি একটি শুষ্ক কাঠের উপর উপবেশন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না।

এই স্থানে বসিয়া মনের বেদনায় আমি কাঁদিতে লাগিলাম। অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। না এদিক্, না ওদিক্, না মরা, না বাঁচা, আমার অবস্থা ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আজ "আমি" সাজিয়া সন্ন্যাসী আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, বাসর ঘরে সন্ন্যাসী গান করিবে, তাহার পর ফুলশয্যা হইবে,—ওঃ! আর আমার প্রাণে সয় না। হায় হায়! আমার সব গেল। হঠাৎ এই সময় মা দুর্গাকে আমার স্মরণ হইল। প্রাণ ভরিয়া মাকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা! তুমি জগতের মা। তোমার এই অভাগা পুত্রের প্রতি তুমি কৃপা কর। মহিষাসুরের হাত হইতে দেবতাদিগকে তুমি পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সন্ন্যাসীর হাত হইতে তুমি আমাকে নিস্তার কর। মনসা লক্ষ্মীর কখন পূজা করি নাই, ঘেঁটু পূজাও করি নাই, কোন দেবতার পূজা করি নাই। কিন্তু এখন হইতে, মা, প্রতি বৎসর তোমার পূজা করিব। অকালে তোমার পূজা করিয়া রামচন্দ্র বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। আমিও মা! সেইরূপ অকালে তোমার পূজা করিব। তুমি আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। ব্রজের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালা মহাপ্রভুরা কসাইকে যখন নবপ্রসূত গোবৎস বিক্রয় করেন, কসাই যখন শিশু বৎসের গলায় দড়ি দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যায়, তখন সেই দুধের বাছুরটি নিদারুণ কাতর কণ্ঠে যেরূপ মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ কাতর স্বরে আমিও মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম।

জগদম্বার মহিমা কে জানে! প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ডাকিলে তিনি কৃপা করেন। জগদম্বা আমার প্রতি কৃপা করিলেন। বন হইতে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া কাঠুরিয়াদিগের মাঝখানে পড়িল। সুন্দরবনের মানুষ-খেকো প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র! শরীরটি হরিদ্রাবর্ণের লোমে আচ্ছাদিত, তাহার

উপর কাল কাল ডোরা। এ তোমার চিতে বাঘ নয়, গুল বাঘ নয়, এ বাবা, টাইগার! ইংরেজিতে যাহাকে রয়াল টাইগার বলে, এ সেই আসল রয়াল টাইগার।

এক চাপড়ে একজন কাঠুরিয়াকে বাঘ ভূতলশায়ী করিল, ফকীরের মন্ত্রে তাহার মুখ বন্ধ ছিল, মুখে করিয়া তাহাকে সে ধরিতে পারিল না। সেই স্থানে শুইয়া থাবা দিয়া মানুষটাকে পিঠে তুলিতে চেষ্টা করিল। না মোটা না সরু নিকটে একটা গাছ ছিল। বাঘের দীর্ঘ লাঙ্গুলটি সেই গাছের পাশে পড়িয়া ছিল। একজন কাঠুরিয়ার একবার উপস্থিত বুদ্ধি দেখ! বাঘের লাঙ্গুলটি লইয়া সে সেই গাছে এক পাক দিয়া দিল, তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধরিল।

বাঘের ভয় হইল। বাঘ মনে করিল,—"মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বুড়া হইলাম, আমার লেজ লইয়া কখন কেহ টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন! তোমাদের একি নূতন কাণ্ড! পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল। এক বার, দুই বার, তিন বার বিষম বল প্রকাশ করিয়া বাঘ পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে পারিল না। অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, যাঃ! লেজটি বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম্ম নাই! পাকা আমের নীচের দিক্‌টা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতার

হিন্দু কসাই মহাশয়েরা জীয়ন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে চর্ম্মবিহীন পাঁঠার শরীর যেরূপ হয়, বাঘের শরীরও সেইরূপ হইল। মাংসের বাঘ রুদ্ধ-শ্বাসে বনে পলায়ন করিল।

ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ ঘোরতর বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাঘের লাঙ্গুল লইয়া গাছে যে পাক দিয়াছিল, লেজ ফেলিয়া সেও সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বাঘ-শূন্য ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘ-ছালের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ব্যাঘ্র-চর্ম্মের ভিতর আমার সূক্ষ্ম শরীর প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ছালটা সজীব হইল। গা ঝাড়া দিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাছ হইতে লাঙ্গুলটি সরাইয়া লইলাম। পাছে ফের পাক দেয়! তাহার পর দুই একবার আস্ফালন করিলাম। পূর্ব্বে তো অবাক্ হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখন দশগুণ অবাক্ হইয়া ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝখানে লইয়া দ্রুতবেগে ভাঁটার স্রোতে তাহারা পলায়ন করিল।

এখন এই নূতন শরীরের প্রতি একবার আমি চাহিয়া দেখিলাম। এখন আমি সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ হইয়াছি—সেই যারে বলে রয়াল টাইগার! ভাবিলাম যে,—এ মন্দ কথা নয়, এখন যাই, এই শরীরে বিবাহ-আসরে গিয়া উপস্থিত হই। এখন দেখি, সন্ন্যাসী বেটা কেমন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি দৌড়িলাম। কখন নিবিড় বনের ভিতর দিয়া চলিলাম, কখন লোকের আবাদের ধার দিয়া চলিলাম। সাঁতার দিয়া অথবা লম্ফ দিয়া শত শত নদী নালা পার হইলাম। যে গ্রামে কন্যার বাড়ী, সন্ধ্যার সময় তাহার এক ক্রোশ দূরে গিয়া পৌঁছিলাম। দূর হইতে আলো দেখিয়া ও

বাজনা-বাদ্যের শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, ঐ বর আসিতেছে। সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম। আলুম করিয়া এক লাফ দিয়া প্রথম বাদ্যকরদিগের ভিতর পড়িলাম, কালো কালো বিলাতী সাহেবেরা কোট পেনটু পিঁধে যাহারা বিলাতী বাজা বাজাইতেছিল, তাহারা আমার সেই মেঘগর্জ্জনের ন্যায় আলুম শব্দ শুনিয়া আর আমার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আপন আপন যন্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ঢাকি ঢুলিদের ত কথাই নাই। তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা আলো প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছিল, তাহারাও সকলে পলায়ন করিল। তাহার পর পুনরায় আলুম করিয়া আমি বরযাত্রদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। টপ টপ করিয়া তাহারা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল ও যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

লম্বোদর বলিলেন,—"আমিও বরযাত্র গিয়াছিলাম। আমি একটি গাছে গিয়া উঠিয়াছিলাম।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষে কেলে-হাঁড়ী মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি একটা পুষ্করিণীতে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিলাম।

সংশোধন ও সংযোজন

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২ : কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

১২৯২ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'তে "প্রামাণিক ধর্ম্ম" নামে কৃষ্ণকমলের আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২ : অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার কিছু দিন তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। ১ ফাল্গুন ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ৪৬০) প্রকাশ :—

> "বিশেষ সভা ১১ পৌষ ১৭৬৮ শক।
>
> ...শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এই প্রস্তাব করিলেন যে সভার কর্ম্ম অত্যন্ত বাহুল্য হওয়াতে সহকারি সম্পাদকের যে সমুদয় কর্ম্ম তাহা এইক্ষণে আমার দ্বারা উপযুক্ত মত সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পত্রিকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্যই সমুদয় সময় ক্ষেপ হয়। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভার সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য আমার পরিবর্ত্তে অন্য এক জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।"

১১ ফাল্গুন ১৭৬৮ শকের অধিবেশনে অক্ষয়কুমারের স্থলে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৭ : নীলরত্ন হালদার

নীলরত্ন হালদার ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮ আগষ্ট ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> "...প্রায় দেড় বৎসর অতিক্রম হইল উক্ত হালদার বাবু লোকান্তরিত হইয়াছেন, তিনি সামান্য মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহার মৃত্যু সমাচার ইংরাজী বাঙ্গালা সকল সমাচার পত্রেই প্রকাশ হইয়াছিল,...।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩০ : মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে **"বেণীসংহার নাটকং** মহাকবি শ্রীভট্টনারায়ণ প্রণীতং শ্রীমুক্তারাম শর্ম্ম বিদ্যাবাগীশেন সংস্কৃতং" বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়। পৃ. সংখ্যা ১২৪। ইহার গোড়ায় ইংরেজী ও বাংলায় গ্রন্থাভাস দেওয়া আছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৩ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩২৯ সালের বৈশাখ ও কার্ত্তিক সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে হেমচন্দ্রের রচিত "তুষানল" ও "বিজয়া" কবিতা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল * চিহ্নিত পুস্তকগুলি ॥০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধা-মোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশাররফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত

১৫। উইলিয়ম কেরী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত

২০। রাধাকান্ত দেব।

শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

*২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।